স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর

অগস্ট মাসে বৃটেন থেকে ভারতীয়রা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পালন করেছেন, অন্তত তাঁদের ভিতরে কিছু লোক তো করেছেনই। কিন্তু ভারতে সোসালিস্টরা তা করেননি, ব্যাখ্যা করছেন ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-র বিনয় সরকার ১

উৎসব বিছিয়ে দেওয়া হল গ্রাম-গ্রামান্তর অবধি - রঙ বাহারে - মেলে ধরা হল তার প্রতীক - জাতীয়তাবাদকে 'জনগণের ঘটনা' হিসেবে আবার জাগিয়ে দিতে। পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের শ্রেণীর অগ্রজ মানুষজন 'স্বাধীনতা'র দাম দিয়েছিল অনেক অনেক রক্তে, কিন্তু তাতেও ঘোচেনি তাদের পরাধীনতা।

জাতীয় স্বাধীনতা একটা পুঁজিবাদী ব্যাবসা বিশেষ। একই শ্রেণীর বংশগত শত্রুতায় ফেঁসে থাকা যতো দল-উপদল - যারা মুনাফার জন্যে সব দখল ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের যতো রাজনীতিবিদ, সংবাদ মাধ্যমের সর্দার আর ভাড়াটে লেখকরা - ভারতীয় এবং পাকিস্তানী ততদূরই যতদূর 'সাম্রাজ্যবাদী' বৃটিশ এবং হয়তোবা তাদের বিশ্বীয় স্বদেশীরা এখন পেয়ে গেলেন একটা চলমান প্রদর্শনী ১৫ অগস্ট ১৯৯৭ তরিখে সেই উপলক্ষের উদ্‌যাপন উৎসবে যা ঘটেছিল একটা শুক্রবারে পঞ্চাশ বছর আগে।

উপনিবেশবাদ

বর্তমান সহস্রাব্দের মধ্যভাগে বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে নতুন নতুন পণ্যবাজার, সস্তা শ্রমশক্তি, কাঁচা উপকরণের উৎস এবং সবচেয়ে চড়া লাভের যতো অঞ্চল খুঁজে বের করার অভিযান থেকে জন্ম নিয়েছিল 'উপনিবেশবাদ'। মহাসাগর পেরিয়ে দেশদেশান্তরে প্রাক্-পুঁজিবাদী সব অর্থব্যবস্থার উপর থাবা বসাতে শুরু করেছিল বাণিজ্যিক পুঁজি। এই প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের শুরু থেকেই তার বিশ্ব-বাজারী বিস্তারের চরিত্র দেখিয়ে দেয়। বৃটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির নৌঅভিযান জব চার্ণককে গঙ্গাতীরে সুতানুটি গ্রামে পৌঁছে দেয় ১৪ই অগস্ট ১৬৯০। এই এলাকায় ক্রমে ক্রমে নবাগত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের আধারে উৎপাদন শক্তিগুলির উন্নতি পত্তন করে পুঁজিবাদী বৃটিশ ইন্ডিয়ার প্রথম রাজধানী নগর কলকাতা। ভারতে পুঁজিবাদ শাখাপ্রশাখা মেলতে থাকে বৃটিশ পুঁজির প্রভাবে বন্দর, রাস্তাঘাট, রেলপথ, কল-কারখানা এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে করতে - আর এসবে পুঁজিপতি আর মজুরদের জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও ত্রলাকাগত পরিচয়ে কিছু গেল এল না। কেননা পুঁজি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক শক্তি। ভারতেও এর উন্নতি হয়েছে এর অন্তর্ণিহিত নিয়মে - সবকিছুকে পর করে দেওয়া, অসম বিকাশ এবং প্রতিযোগিতার গতির নিয়মেই। লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহ, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশ, ঢোলশোহরত ঘোষণা এদেশেও অন্য সব দেশের মতোই পুঁজির গতিধারার ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

চরম দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ও দমন-পীড়নের পরিস্থিতি সৃষ্ট গণবিক্ষোভকে শৃঙ্খলার খাতে বহিয়ে দিতে ওদের একটা জনপ্রিয় মঞ্চের প্রয়োজন দেখা দেয়। কয়েকজন বৃটিশ উচ্চপদস্থ অফিসার - হিউম, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতির উদ্যোগে ও *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রবার্ট নাইটের সমর্থনে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকজন, বুদ্ধিজীবি ও তাদের সমর্থকদের নিয়ে ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর চালু হয় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বার্ষিক সমাবেশ - এরই নাম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের এটা দরকার হয়েছিল একটা 'সেফটি-ভাল্‌ভ' হিসেবে কাজ করতে। কেননা ততদিনে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী এবং নিরাপদ বৃটিশ পুঁজিপতি শ্রেণী তরোয়াল নিয়ে শাসন করার চেয়ে কথা দিয়ে শাসন করার কায়দা শিখে নিচ্ছিল।

১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তিলকের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ স্বায়ত্ব-শাসনের প্রস্তাব দেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পান। ইতিমধ্যে অন্যদিকে ঐ বছরের শেষে ৩০ শে ডিসেম্বর একদল সচ্ছল ভারতীয় এদেশের মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয়ে তাদের আলাদা রাষ্ট্রের জন্য 'পাকিস্তান' প্ল্যান অনুসারে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২০ নাগাদ তাশখনন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির মুখপত্র '*দ্য ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স*' প্রকাশ শুরু হয় ১৯২২-এর ১৫ই মে। পরে তা নাম বদলে হয় '*দ্য মাসেস অব ইন্ডিয়া*' ১৯২৫-এর ১লা জানুয়ারী। একেবারে শুরু থেকেই সি পি আই মার্কস এবং এঙ্গেলসের - শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিকশ্রেণীরই নিজস্ব কাজ, এবং মেহনতীদের কোন দেশ নেই - এই শ্রেণী অবস্থান না গ্রহণ করে মেনে নিয়েছিল মারাত্মকভাবে ওলটান লেনিনের সেই মতাদর্শ যে, মজুরদের চালিত হতে হবে জনাকয়েকের এক অগ্রবাহিনীর দ্বারা, যে, মজুররাই হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রেমিক, এবং যে, 'সমাজতন্ত্র' জাতীয়-রাষ্ট্রসমূহকে নিরাপদে রাখে, এবং আরও যে, এই বিশ্বে সংগ্রাম চলছে সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে, মানে সংগ্রামটা পুঁজিপতিদের সঙ্গে মজুরদের সংগ্রাম নয়। যাই হোক, কথায় বলে, 'কোন পার্টি দুই প্রভূর সেবা করতে পারেনা'। একটা পার্টি কেবল একটা বা অপর একটা শ্রেণীরই সেবা করে।

স্ট্রাইক এবং দাঙ্গা

বোম্বাইয়ের দু'লক্ষ (২০০,০০০) মজুর ১৯১৯-এর ২রা জানুয়ারি জেনারেল স্ট্রাইকে সামিল হন। পরে মহামন্দার কারণে স্ট্রাইক হয়েছিল ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতে - বোম্বাইয়ের বস্ত্রকলগুলিতে (১৬ এপ্রিল থেকে ৫ অক্টোবর ১৯২৮), টাটা লৌহ-ইস্পাত, দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে, লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্ক শপ, বেঙ্গল জুট মিলস, কলকাতা ঝাড়ুদার, ইত্যাদিতে। কলকাতা ঝাড়ুদার স্ট্রাইক (এপ্রিল ১৯২৮) দেখিয়ে দেয় যে সিটি কাউন্সিল ততদূরই উৎপীড়নকর হতে পারে যতদূর বৃটিশ জাতীয়তাবাদীরা। টাটা স্ট্রাইকের (জানুয়ারি ১৯২৮) শিক্ষা এই যে নেতারা নিজেদের লাভের জন্যে স্ট্রাইক শেষ করতে যাকিছু দরকার করবে। জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষ বসু একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদ নিয়েছিলেন, আর তারপর মজুরদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন সেই সব শর্ত মেনে নিয়ে যেগুলি তিনি নিজেরই এক প্রারম্ভিক বক্তৃতায় অসম্ভব বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই নেতা এক সময় ঘোষণা করেছিলেন - 'আমাকে রক্ত দাও: আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।'

বোম্বাইয়ে বার্মা অয়েল ওয়ার্কস্-এ ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮ একটা স্ট্রাইক শুরু হয়েছিল এবং গণ পিকেট দিয়ে তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মালিকরা স্ট্রাইক ভাঙ্গার ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে পাঠানদের (পিছিয়েপড়া চাষি এবং পাহাড়বাসী) আনতে লাগল। তিক্ত এবং রক্তাক্ত সব সংঘর্ষ ঘটনাক্রমে বোম্বাইয়ের রাস্তায় বহু মজুরকে -১০০,০০০ জনকে - ব্যাপক বিক্ষোভে টেনে নামাল। এই সময়ে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে শত্রুতা উস্কে তোলার জঘণ্য প্রচেষ্টাও চলছিল। যখনই কোন স্ট্রাইক হয়েছে তখনই পুঁজিপতিদের দালালরা উঠেপড়ে লেগেছে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে, যাতে করে মালিক এবং মজুরদের মধ্যেকার সংগ্রামকে বদলে ফেলা যায় দুটো ধর্মীয় ভীড়ের মধ্যেকার শত্রুতায়।

১৯৩০ সালে পেশোয়ার ১০ দিন ধরে জনগণের দখলে ছিল। হিন্দু রেজিমেন্টের দুটি প্ল্যাটুন মুসলিম জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল ও জনগণের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে নিয়ে ছিল। ১৯৩০-এর মে মাসে শোলাপুর শহর ছিল জনগণের দখলে এক সপ্তাহ ধরে, আর জুলাই মাসে বোম্বাই দেখেছিল বিশাল বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ। সবই কিন্তু হয়েছিল একটা খপ্পরে পড়তে - জাতীয়তাবাদী মোহজালের খপ্পরে। একই সময়ে বম্বে মিল ওনার্স এসোশিয়েশন এবং চেম্বার অব কমার্স (বৃটিশ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যৌথ) দাবি তুলল - ভারতের জন্য 'স্ব-শাসন' চাই।

দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষহল -মরল 'অল্পবিস্তর কুড়ি থেকে চল্লিশ লাখ' (FAD হিসাব)। অথচ, মাথা পিছু প্রাপ্তিযোগ্য (চাল ও গমের) ১৯৪৩-এর সূচক ১৯৪১-এর তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ উপরে ছিল। বঙ্গদেশ ১৯৪৩-এ উৎপাদন করছিল তার ইতিহাসে সর্বাধিক পরিমান ধানের ফসল। দুর্ভিক্ষে নিহতদের ভিতরে বৃহত্তম অংশটি ছিল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক। খাদ্য তারা উৎপাদন করল, কিন্তু নিজেদের খাবার জন্যে পারলনা তা ফিরে কিনে নিতে, কেননা কেনার টাকা ছিলনা তাদের, কেননা তারা শুধু কাজ করেছিল - মালিক তো ছিলনা তারা।

ক্ষমতা হাত বদল

ভাইসরয় সই করলেন 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অর্ডার এন্ড ইন্টারন্যাশানাল অ্যারেঞ্জমেন্টস' নামায় ১৪ই অগস্ট ১৯৪৭ - 'বৃটিশ ইন্ডিয়া' দুভাগ করে - দ্য ডমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া যার গভর্ণর-জেনারেল হলেন মাউন্টব্যাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন নেহেরু, আর ডমিনিয়ন অব পাকিস্তান যার গভর্ণর-জেনারেল হলেন জিন্না এবংপ্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ। কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেমব্লীর একটা স্পেশাল মিড-নাইট অধিবেশন পাশ করল শপথ প্রস্তাব যার প্রতিশ্রুতি: 'সার্বজনীন উন্নতি'। ইন্ডিয়ান কমস্টিট্যুয়েন্ট এসেমব্লীর প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ বললেন তাঁর প্রচেষ্টার শপথ হবে - 'দারিদ্র, ক্ষুধা এবং রোগজ্বালা দূর করা, পার্থক্য ও শোষণ উচ্ছেদ, এবং জীবনযাত্রার শোভন পরিবেশ নিশ্চিত করা'। নেহেরু বললেন, 'দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকবে, ভারত জেগে উঠবে জীবনে ও স্বাধীনতায়। একটি মূহুর্ত আসে, যা আসে কিন্তু ইতিহাসে বিরলভাবে , যখন আমরা বেরিয়ে যাই পুরাতন থেকে নতুনে।'

১৯৪৭-এ মনিব বদল

এখন কিন্তু 'নতুনটির' রইলোনা কোন সমস্যা 'পুরাতনের' সঙ্গে মিলতে, এটলির পাঠানো 'ভারতের সরকার এবং জনগণের প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা' বার্তার জবাবে নেহেরু স্পষ্টই জানালেন, 'কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ' এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 'ঘনিষ্টতম সহযোগিতা' বহাল রাখার নিশ্চয়তা।

উৎসব এসে গেল: 'স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ', 'রুট মার্চ', 'পতাকা উত্তোলন', 'কামান-অভিবাদন', অন্যদিকে তখন গান্ধী এবং সুরাবর্দী কলকাতার বেলেঘাটায় তাঁদের যৌথ শান্তি দৌত্য সেরে গেছেন উপবাস ও প্রার্থনা করতে।
'*দ্য মাসেস অব ইন্ডিয়া*' পেয়ে গেল '*ইনডিপেনডেন্স*'।
কলকাতার জনগণ হুকুম পেল 'ফ্রীডম' উপভোগ করতে, তবে কারফিউয়ের ভিতরে - 'বিশৃঙ্খল পরিবেশের জন্যে'। আর *দ্য স্টেটসম্যান* (১৫ অগস্ট ১৯৪৭) সংবাদ শিরোনাম ছাপল: 'পলিটিক্যাল ফ্রীডম ফর ওয়ান-ফিফথ অব হিউম্যান রেস' - 'জয়ফুল সীনস ইন ক্যালকাটা'। মন্তব্য অনাবশ্যক।
পাকিস্তান সৃস্টি হল উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে ধর্মীয় সমরূপতার ধারণায়।
তৎসত্তেও ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধে গেল ১৯৬৫-তে 'কাশ্মীর প্রশ্নে' আর ১৯৭১ ডিসেম্বরে 'বাংলাদেশ' বিবাদে।
১৯৭২-এ পূর্ব পাকিস্তান হল 'স্বাধীন' বাংলাদেশ ভাষাগত সমরূপতার ধারণায়। দুটো ধারণাই সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে ভ্রমপূর্ণ। তারপর বাংলাদেশ তার মজুরদের দিল একটা দুর্ভিক্ষ ১৯৭৪-এ।
'স্বাধীনতা' আমাদের ভোট এনে দিয়েছে ১৯৪৮-এ - এই প্রচারটা অসত্য। মজুরদের অর্জন করতে হয়েছে তা।
ভারতে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের চাপে ১৯০৯-এর মর্লি-মিন্টো সংস্কার দিয়ে। ১৯৩৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট 'গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ করল - এর নাম হল 'নিউ কন্‌স্টিটিউশন' - এই আইনে ৩ কোটির অধিক সংখ্যক ভারতীয় (জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ) ভোটের অধিকার পায়। ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হল। এইভাবেই এল ভোটপত্র। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে গণতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র ভোটপত্র বোঝায় না, বোঝায় বিশ্ব-সমবায়ী সার্বজনীন সমৃদ্ধি নির্ভর অংশগ্রাহী গণতন্ত্র - প্রত্যাহারযোগ্য-প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত-সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

'ফিরে যাও' থেকে 'ফিরে এসো'

১৯৪২-এ ভারতীয় নেতারা আওয়াজ তুলেছিল: 'ভারত ছাড়ো' - 'ফিরে যাও'। আজ তারা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে: 'ভারত ধরো' - 'ফিরে এসো'। অবশ্যই, কিন্তু শাসন করতে নয়, পুঁজি লগ্নি করতে - ইন্দো-বৃটিশ, ইন্দো-জাপানিজ, ইন্দো-আমেরিকান 'যৌথ উদ্যোগে'।
আবার চলছে গোলটেবিল বৈঠক। কিন্তু এবার কথা চলছে 'আন্তর্জাতিক পরস্পরনির্ভরতা' নিয়ে, 'জাতীয় স্বাধীনতা' নিয়ে নয়। কথা ওদের বলতেই হবে, ওরা কথা বলারই লোক, কেননা ওরা মালিক। ওদের কাজ করতে হয়না, শুধু কথা বলতে হয় - বলতে হয় আমাদের কথা না বলে কাজ করতে। ওদের জন্যে 'কথা সংস্কৃতি', আমাদের জন্যে 'কর্ম সংস্কৃতি', এবং ওরা ওদের মতাদর্শে অটল। তবে ওরা যখন ওদের মুনাফা-ভুখা দুর্বৃত্তদের সঙ্গে দল পাকিয়ে জাহির করে যে তারা নাকি আন্তর্জাতিক লগ্নিকে লাগাচ্ছে আমাদের শিশুদের লালন-পালন এবং 'জীবনযাত্রার শোভন পরিবেশ' সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের সবদিকে, তখন আমরা দেখি ওরা প্রতারক হয়ে পড়ছে আর ভয় পাচ্ছে সত্যকে।
'এখন উৎসবের অভিমুখের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে তারুণ্য' - চলল কেন্দ্রীয় উদ্‌যাপনের আহ্বান। বামপন্থীরা লড়তে বলল তরুণদের 'কাজের অধিকারের জন্যে', সেরেফ শোষিত হবার 'অধিকারের' জন্যে!
সোসালিষ্টরা কখনো তরুণদের 'অধিকার' চাইতে যেতে বলেনা। তার বদলে আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করি তাদের প্রভূদের ভোজপর্বের বাসনকোসনে ফেলে রাখা টুকরো-টাকরা পাবার কথা ভুলে যেতে, আর তার জায়গায় গোটা ভোজপর্বটাই নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে - বদলে দিতে পুঁজিবাদী প্রতীক: 'এক জাতি - এক রাষ্ট্র', সোসালিষ্ট প্রতীক: 'এক জগৎ - এক জনগণ' হাতে তুলে নিয়ে। ভয় তাড়াও, আন্দোলনের ভিতরের একজন হয়ে উঠতে নিজেকে মুক্ত করো। খুঁজতে বেরিয়োনা এই ভেবে যে তোমার কোন নেতা দরকার।

---

[১] - লন্ডন থেকে প্রকাশিত *সোসালিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকার অক্টোবর ১৯৯৭ সংখ্যা অনুসারে বাংলা তরজমা।

- **শ্রমিকশ্রেণী বলতে বোঝায় বিশ্বশ্রমিকশ্রেণী।**
- **একজন মজুর একটা দেশের, কিন্তু দেশটা মালিকদের।**
- **শ্রমিকশ্রেণীর কোন দেশ নেই, না বাঁচাবার মতো - না মরবার মতো। দেশ-বিদেশ ভাগাভাগি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীঐক্যের বাধা।**
- **দেশপ্রেমিক হচ্ছে সেই লোক যে চায় তার দেশের জন্যে তুমি মর।**
- **'দেশপ্রেম হল পাজী লোকের শেষ আশ্রয়' - লিখেছেন ডঃ স্যামুয়েল জনসন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে।**

পড়ুন:

ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-র

MANIFESTO / ইস্তাহার / পরিচিতি / ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট

MARXISM AND ASIA / মার্কসবাদ ও এশিয়া

গ্রেট বৃটেনের সোসালিষ্ট পার্টির ১৯৯৬ গ্রীষ্মকালীন স্কুলে বার্মিংহাম ফায়ারক্রফ্‌ট কলেজে ৬ই জুলাই ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)-র প্রতিনিধি বিনয় সরকারের বক্তৃতা। ইংরাজি বক্তৃতার টেপ ক্যাসেট এবং ইংরাজি ও বাংলা পুস্তিকা সহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই বই, পত্রপত্রিকা, ইস্তাহার ও প্রচারপত্র পাওয়া যাচ্ছে।

THE WORLD SOCIALIST PARTY (INDIA)

২৫৭ বাঘাযতীন 'ই' ব্লক (ইষ্ট), কলকাতা ৭০০০৮৬
টেলিফোন: ০৩৩-২৪২৫-০২০৮
E-mail: wspindia@hotmail.com , wsp_india@yahoo.com